Legalised Hetairism practised under various forms and restrictions among many peoples, savage, barbarous and civilised is thought to be a proof of original communism. The same is true of "proof marriages" existing among the Wotzoken, the Burmese, the Germans, of "temporary marriages" among the Parthians and American Indians and of "wife-lending" examples of which are afforded by the Spartans, Romans, Hindus, Arabs, Eskimos and many other peoples.

The argument for original promiscuity based on these evidences however is not conclusive. For many of them are capable of simpler explanations—for example, the custom of wife-lending, as Westermarck shows, was due to the savage idea of hospitality. Though the Ires primæ noctis—the general name which is given to these customs—is naturally explainable as due to various other causes, yet the researches of Spencer and Gillen have produced many evidences in favour of an original state of promiscuity upon which Hildebrand Kautsky and specially Morgan have tried to re-establish the theory of Promiscuity.

(To be concluded in the next issue).

পূর্ব্ববঙ্গে বাণপর্ব্বন।

এবার পরীক্ষা দিয়া যখন বুঝিতে পারিলাম বি, এ, পড়া আমার অদৃষ্টে নাই, ভাবিলাম একবার বেড়াইতে যাইব। অনেক "কর্ম্মখালি"তে উমেদারী করিতে করিতে ময়মনসিংহ জেলায় টাঙ্গাইল সবডিভিসনে এক মাইনর স্কুলে ১৫৲ টাকা বেতন এবং প্রাইভেট পড়াইলে আঃ বাঃ ফ্রী (অর্থাৎ আহার এবং বাসস্থান পাওয়া যাইবে) এইরূপ এক মাষ্টারী জুটিয়া গেল। নিযুক্তিপত্র পাইবামাত্র কর্ম্মস্থলে রওনা হইলাম। ট্রেনে ও ষ্টীমারে দেড়দিন কাটিয়া গেল। পরদিন দুইপ্রহরের সময় এক নদীর বালুকাময় চরভূমিতে ষ্টীমার লাগিল। আমাকে তথায় নামিতে হইল। চৈত্রমাসের মাথাফাটা রৌদ্রে সেই বালুচরে নামিয়াই আমার চাকুরি করিবার উৎসাহ অর্দ্ধেক কমিয়া গেল। মনে হইল, এখনই যদি ষ্টীমার পাইতাম তবে চাকুরির আশা পরিত্যাগ করিয়া ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিতাম। শুনিলাম পরদিন সকালবেলা আবার ষ্টীমার ছাড়িবে, কাজেই

কর্ম্মস্থলে যাওয়াই আমার মন্দের ভাল বোধ হইল। পাঁচ ক্রোশ রাস্তা হাঁটিয়া রাত্রিতে কর্ম্মস্থলে পঁহুছিলাম। জায়গাটী দেখিয়া বেশ পছন্দ হইল। পথশ্রম ভুলিয়া যাইয়া মাষ্টারী আরম্ভ করিলাম। স্কুলে পাঁচ ঘণ্টা পড়াইতে হয়—সকালে এবং বৈকালে ২।৩টী ছেলেকে প্রাইভেট পড়াই। এইভাবে একরূপে দিন কাটিতে লাগিল।

চৈত্রমাসের শেষ ভাগে এখানে একটী বড়ই আমোদজনক উৎসব দেখিতে পাইলাম। এই অঞ্চলে উহা "বাণপর্ব্বন" নামে অভিহিত। চলিত ভাষায় "চৈত্রপূজা বা দেইলপূজা" বলা হয়। সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীস্থ হিন্দুদের মধ্যেই এ পূজা প্রচলিত। বাণরাজা প্রথম এ পূজা প্রচলন করেন বলিয়া ইহার নাম "বাণপর্ব্বন।" ইহাদের উপাস্য দেবতা মহাদেব। কিন্তু ইহারা মহাদেবের কোন মূর্ত্তি-বিশেষকে পূজা করে না। একখণ্ড কাষ্ঠফলকে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম প্রভৃতি চিহ্ন ক্ষোদিত করিয়া উহার মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটী লৌহনির্ম্মিত ত্রিশূল বসাইয়া দেয়। ঐ কাষ্ঠফলকের সম্মুখের দিক্ পশ্চাৎ দিক্ অপেক্ষা অপ্রশস্ত। এই অপ্রশস্ত অংশের দুই দিকে স্বর্ণরৌপ্য-নির্ম্মিত চক্ষুঃ বসান থাকে। পশ্চাৎ হইতে সম্মুখ পর্য্যন্ত একখণ্ড পট্টবস্ত্র দ্বারা আবৃত এবং শঙ্খ-চক্র প্রভৃতি চিহ্নিত অংশ তৈল এবং সিন্দুর দ্বারা রঞ্জিত হইয়া থাকে। ইহাকেই তাহারা উপাস্য দেবতার প্রতিমূর্ত্তিরূপে প্রতিষ্ঠা করে। বেল বা নিম কাঠ ব্যতীত অন্য কোন কাঠে এই ঠাকুর নির্ম্মাণ হয় না।

যাহারা এই পূজায় যোগদান করে তাহাদিগকে সন্ন্যাসী বলে। প্রথম পূজার দিন সন্ন্যাসীরা একত্র হইয়া নিকটবর্ত্তী জলাশয়ে ঠাকুর স্নান করাইতে যায়। ঠাকুরের স্নানের জল যাহারা স্পর্শ করে তাহাদিগকেই সন্ন্যাসী হইতে হয় অর্থাৎ পূজায় যোগ দিতে হয়। সমস্ত সন্ন্যাসীই গেরুয়া পরিধান করে, নিরামিষ আহার করে এবং তৈল ব্যবহার করে না। এই পূজার আর একটা বিশিষ্টতা এই যে, ইহাতে জাতিভেদ বড় একটা লক্ষিত হয় না; যে কোন জাতির মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিই পুরোহিত বা মূলসন্ন্যাসী হইতে পারে। সন্ন্যাসীরা ঠাকুর স্নান করাইয়া পূজাবাড়ীতে ঠাকুর লইয়া আসে, সন্ধ্যাবেলা আরতি না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা কিছু আহার করে না। প্রথম দিন এইরূপেই কাটিয়া যায়। দ্বিতীয় দিন হইতে সন্ন্যাসীরা প্রাতঃকালে ঠাকুর লইয়া ভিক্ষায়

বাহির হয় এবং সমস্ত দিন পরে সন্ধ্যাবেলা ফিরিয়া আসে। এই ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলাদি দ্বারাই সন্ন্যাসীদের আহার হইয়া থাকে।

সন্ন্যাসীরা প্রাচীন কবিদিগের কবিত্ব ও উপদেশপূর্ণ পাঁচালী এবং নিমাই সন্ন্যাস, দূতীসংবাদ, মানভঞ্জন, বীরবাহুবধ, সাবিত্রী-সত্যবান্, মাধব-সুলোচনা প্রভৃতি নানাবিধ ছড়া এবং কবিতা সুমধুর স্বরে গান করিয়া পল্লীতে পল্লীতে গৃহে গৃহে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। দ্বিজ বংশীদাস, অন্ধ কবিওয়ালা কালীচরণ প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের মনসার ভাসান এবং ছড়া-পাঁচালীর ন্যায়, এই সমস্ত কবিতাগুলিও পল্লী-সংস্কার গ্রাম্য সমাজগঠন এবং সরলপ্রাণ নিরক্ষরদিগের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব-বিকাশের সহায়তা করিয়া থাকে। অন্ততঃপক্ষে এরূপ নির্দ্দোষ আমোদ উৎসাহ পাইবার যোগ্য সন্দেহ নাই। সন্ধ্যাবেলা ঠাকুরের আরতির পর কবিতা এবং ছড়া-পাঁচালী প্রভৃতি গান এবং নানাবিধ হাস্যকৌতুকাদিপূর্ণ নৃত্যগীতাদি হইয়া থাকে। এইরূপে ৩।৪ দিন কাটিয়া যায়। শেষ পূজার দিনের নাম 'হাজরা'।

এই "হাজরা"র দিনই সর্ব্বাপেক্ষা আমোদজনক। 'হাজরা'র দিন সন্ন্যাসীরা ঠাকুর লইয়া ভিক্ষায় বাহির হয় না। সেদিন হরগৌরীর শোভাযাত্রা বাহির হইয়া থাকে। এই শোভাযাত্রায় যদিও দর্শনোপযোগী কিছু থাকে না, তথাপিও ইহা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক এবং আমোদজনক। শোভাযাত্রার প্রথমেই নানা-বর্ণের পতাকাধারী সন্ন্যাসী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতে থাকে। তাহাদের পতাকায় কোনটিতে "হরিনাম সত্য", কোনটিতে বা "দেবের দেব মহাদেব", আবার কোন কোনটিতে আধুনিক রুচি এবং প্রথার পরিচায়ক "সমরঋণ" "সম্রাটের জয়" প্রভৃতি লিখিত থাকে। নিশানধারী সন্ন্যাসীদের পশ্চাতে ঢাল এবং লাঠিধারী সন্ন্যাসী, তাহার পশ্চাতে ঢাক ঢোল, সানাই ব্যাণ্ড প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্য, তৎ-পশ্চাতে জটাজূটধারী ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিহিত শূলপাণি, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভস্মমাখান, আভরণ রুদ্রাক্ষের মালা, মস্তকে জটার উপরিভাগে কৃত্রিম সর্প, বামহস্তে ডমরু, স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি। এই বিভূতিভূষণ দিগম্বর বেশ দেখিলে মনে হয় ভোলানাথ বোধ হয় পথ ভুলিয়া কৈলাস ছাড়িয়া মর্ত্তে আসিয়াছেন। হরের বামপার্শ্বে সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতা, পট্টবস্ত্র-পরিহিতা মা অন্নপূর্ণা, তাঁহার গলদেশে পুষ্পমাল্য, বামহস্তে অন্নপাত্র, চরণে নূপুর। চামরব্যজনকারিণী সখীর বেশে জয়া ও বিজয়া

তাঁহার অনুবর্ত্তিনী। কারুকার্য্যময় এক বৃহৎ আতপত্র ইঁহাদের মস্তকোপরি বিস্তৃত। তৎপশ্চাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু নারদ প্রভৃতি দেবগণ এবং নন্দী ভৃঙ্গী প্রভৃতি অনুচরগণ। সর্ব্বশেষে কীর্ত্তনের দল। এই শোভাযাত্রা পূজাবাড়ী হইতে বাহির হইয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া আবার পূজাবাড়ীতে ফিরিয়া যায়।

সন্ধ্যাবেলা হরগৌরীর মৃন্ময় মূর্ত্তির পূজা হয়। এখানে অবস্থাবিশেষে পাঁঠা এবং মহিষও বলি হইয়া থাকে। অন্যদিনের মত এইদিন বাড়ীতে ঠাকুরের পূজা হয় না। রাত্রি দুইপ্রহরের পর মূল-সন্ন্যাসী তাহার দেহে ঠাকুরের আবির্ভাব করাইবার জন্য মন্ত্র পড়িতে থাকে। ঠাকুরের আবির্ভাবকে "ভার হওয়া" বলে। সন্ন্যাসী ক্রমেই উচ্চ হইতে উচ্চতর কণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারণ করে, এদিকে প্রাঙ্গণে ঢাকের বাজনা এবং সন্ন্যাসীদের সমবেত কণ্ঠে উচ্চধ্বনিতে কর্ণ বধির হইবার উপক্রম হয়। যখন মূল-সন্ন্যাসীর উপরে ঠাকুরের সম্পূর্ণ "ভার" হয়, তখন সন্ন্যাসী এক রুদ্রাক্ষের মালা হাতে লইয়া পূজাগৃহ হইতে প্রাঙ্গণে বাহির হইয়া পড়ে এবং ঢাকের বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে নাচিতে থাকে। এইরূপ কতক্ষণ তাণ্ডব-নৃত্যের পর সন্ন্যাসীরা তাহার হাতের মালা লইয়া যায় এবং তৎপরিবর্ত্তে খড়্গ এবং শঙ্খ হাতে দিয়া দেয়। খড়্গ লইয়া কিছুক্ষণ নাচিবার পর সন্ন্যাসী প্রাঙ্গণ হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া যায়। তখন অন্যান্য সন্ন্যাসীরা পূজোপকরণাদি লইয়া নিকটবর্ত্তী শ্মশানে যায় এবং পূজার আয়োজন করিয়া ঢাক বাজাইতে থাকে। মূল-সন্ন্যাসী খড়্গ এবং শঙ্খ হাতে করিয়া দ্রুতবেগে ছুটিয়া আসিয়া পূজা করিতে বসে। তাহার উপর যতক্ষণ ঠাকুরের "ভার" থাকে, সে কাহারও সঙ্গে কথা বলে না এবং মুহূর্ত্তকালও স্থির হইয়া থাকে না। নর্ত্তন ধাবন উল্লম্ফন প্রভৃতিই ঠাকুরের "ভার" হওয়ার লক্ষণ। পূজা করিতে করিতে মূল-সন্ন্যাসী হতচৈতন্যের মত হইয়া পূজার বেদীর উপর পড়িয়া যায়। তখন অন্যান্য সন্ন্যাসীরা তাহাকে ঐস্থানে ঐভাবে রাখিয়া বাড়ী চলিয়া আসে এবং ঢাক বাজাইতে থাকে। তখন মূল-সন্ন্যাসী পূর্ব্ববৎ দ্রুতবেগে দৌড়াইয়া পূজা-মণ্ডপে আসিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং ঠাকুরের পাদোদক তাহার মাথায় দিবামাত্রই জ্ঞানসঞ্চার হইতে থাকে। অজ্ঞানাবস্থায় তাহাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেও সে উত্তর দেয়। প্রশ্নকর্ত্তা কিসে ব্যাধিমুক্ত হইবেন অথবা তাঁহার অন্ধপুত্রের দৃষ্টিশক্তি হইবে কি না এইরূপ প্রশ্নই সচরাচর জিজ্ঞাসিত

হইয়া থাকে। এইভাবে "হাজরা"র রাত্রি কাটিয়া যায়। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, চৈত্র-সংক্রান্তির পূর্ব্বরাত্রে হাজরা হইয়া থাকে।

পরদিন চৈত্র-সংক্রান্তি। ভোরবেলায় সন্ন্যাসীরা নিকটবর্ত্তী জলাশয়ের কর্দ্দমের নীচে হইতে চড়ক তুলিয়া লইয়া আসে এবং চড়কতলা-নামক নির্দ্দিষ্ট স্থানে উহাকে সোজা করিয়া প্রোথিত করিয়া রাখে। অপরাহ্ণে এই চড়ক-তলায় বাজার বসে। চড়কের ব্যাপারে একটী কাণ্ড আছে। এই অঞ্চলে তাহাকে "জিহ্বা বাণাম" বলে। "জিহ্বা বাণাম" অর্থাৎ ৩।৪ হস্ত পরিমিত লম্বা এবং $\frac{1}{8}$ ইঞ্চ পরিধিবিশিষ্ট একটী লৌহ-শলাকাদ্বারা কোন এক সন্ন্যাসীর জিহ্বা বিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এই লৌহ-শলাকার নাম "আদা"। সন্ন্যাসী স্বেচ্ছায় "বাণাম লইয়া" থাকে অর্থাৎ জিহ্বা বিদ্ধ করে। অনেক সময় দেখা যায় আগামী পূজায় "বাণাম লইব" বলিয়া ঠাকুরের নিকট মানত করে। মূল-সন্ন্যাসীই জিহ্বা বিদ্ধ করিয়া দেয়। মন্ত্রপূত জল এবং সন্ন্যাসীর কুলকুচা দ্বারা সিক্ত একখণ্ড বস্ত্র ঐ ব্যক্তির মাথায় দিয়া দেওয়া হয়। এই অসহ্য-যন্ত্রণাপূর্ণ কার্য্য তাহাদের দেবতার প্রতি অচলা ভক্তির পরিচায়ক। এইভাবে জিহ্বা বিদ্ধ করিয়া তাহারা সমস্ত বাজার প্রদক্ষিণ করে এবং চড়ক সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া "আদা" খুলিয়া ফেলে। "আদা" খুলিয়া ফেলিয়া মূল-সন্ন্যাসী জিহ্বা খুব জোরে টিপিয়া দেয় এবং একটী কচি আম চিবাইয়া খাইতে দেয়। ইহাতেই নাকি জিহ্বায় আর কোন যন্ত্রণা হয় না। চড়কের দিন উল্লেখযোগ্য আর কিছু দেখা যায় না।

পরদিন অর্থাৎ ১লা বৈশাখ সন্ন্যাসীরা কালীমূর্ত্তি সাজাইয়া বাড়ী বাড়ী কালী লইয়া যায় এবং শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ, রক্তবীজ-বধ প্রভৃতি নানাবিধ দৃশ্য দেখাইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, সন্ন্যাসীদের মধ্য হইতেই একজন কালী সাজিয়া থাকে। সেইদিন রাত্রিতে তাহাদের "মৎস্যমুখী" অর্থাৎ তাহারা আমিষ ভক্ষণ করে। হরগৌরীপূজার পাঁঠাটীর এইদিন সদ্গতি হয়। পরদিন সকাল-বেলায় সন্ন্যাসীদের বিদায়। সেই দিনকে বলে "মালাচন্দন"। সমস্ত সন্ন্যাসীই প্রথম মূলসন্ন্যাসীকে মালা এবং চন্দন দিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করে। তৎপরে পরস্পর পরস্পরে মালা বদল আলিঙ্গন প্রভৃতি করিয়া বিদায় লয়। এই বিচ্ছেদজনিত কষ্টে অনেকে অশ্রু সংবরণ করিতে পারে না। বাস্তবিকই ইহাদের এই উৎসবটী

সরলতা, একপ্রাণতা, একাগ্রতা, ভক্তি এবং আনন্দে পরিপূর্ণ। বৈশাখ মাসেও এই উৎসব একবার হয়। তাহাকে "কাল বৈশাখী" বলে।

শ্রীহীরালাল রায়,
দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী "ঈ" শাখা।

আমার জগৎ।

'সকলে জন্মে, তাই আমিও জন্মিয়াছি। সকলে সকলের জগতে জন্মে, আমিও আমার জগতে জন্মিয়াছি। কাহারও জগৎ আমোদ-আহ্লাদের, আবার কাহারও হর্ষ-বিষাদের। কেহ আপন জগতে স্বীয় উর্ব্বর মস্তিষ্কের নব নব উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়া, অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। কেহ নশ্বর জগতের স্থায়িত্ব-বিশ্বাসে প্রতারিত হইয়া আপন জগৎকে দ্বেষ, হিংসা, পরিবাদ ও পরনিন্দায় কলুষিত করিয়াছে। আবার কেহ জল-বুদ্‌বুদের ন্যায় আপন জগতে আপনি জন্মিতেছে ও আপন মনে আপনিই আপনার জগতে বিলীন হইতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি আমার জগতে জন্মিয়াছি; কিন্তু আমার জগৎ সাধারণের জগতের ন্যায় এক ভাবাপন্ন নহে। প্রশান্ত-সলিলা স্রোতস্বিনী যেমন সান্ধ্য সমীরণে সঞ্চালিত হইয়া কখনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উর্ম্মি কখনও বিশাল তরঙ্গরূপ ধারণ করে;—তেমনই আমার জগতে উর্ম্মি আছে, তরঙ্গ আছে, জোয়ার ও ভাটাও বহে। আমার জগতে জ্ঞান আছে অজ্ঞানতা আছে, হর্ষ আছে বিষাদ আছে; দান আছে প্রতিদান নাই, আশা আছে কৃতকার্য্যতা নাই, ক্ষোভ আছে সান্ত্বনা নাই, কর্ম্ম আছে কারক নাই, চক্ষুঃ আছে দৃষ্টিশক্তি নাই, শরীর আছে শক্তি নাই, শত্রু আছে সমবেদনানুভাবী হৃদয় নাই।—তাই বলি আমার জগৎ বিচিত্র জগৎ!

আমার এই কর্ম্মশূন্য, লক্ষ্যশূন্য ও মূল্যহীন জগতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সকলকে বলিব বলিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া আশা পোষণ করিয়া আসিতেছি, কিন্তু আশার আশায় ভর পাই না, সাহসে বেড় পাই না। কি জানি দরিদ্রের কথায় কেহ কর্ণপাত করেন কি না।